যে কথা শিক্ষামন্ত্রী বলেননি সম্ভবত ভাবছেনও না

শফি সারোয়ার

কিছুটা পর্যবেক্ষণ এবং সরাসরি ভুক্তভোগীদের মুখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের কলেজগুলোর সার্বিক অবস্থা শুনে ও দেখে ভেবেছিলাম আমার লেখার শিরোনাম দেব "বেহাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বিধ্বস্ত কলেজ শিক্ষা।" কিছুদিন আগে সাংবাদিকদের কাছে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা, শিক্ষকদের দায়িত্ব, নকলের কারণ, তার প্রতিরোধ- মোট কথা শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কে তাদের ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ এবং আগামীতে আর কি কি করতে যাচ্ছেন তার বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। সে সময়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও শিক্ষা উপমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ অন্য বড় বড় কর্মকর্তা তো উপস্থিত ছিলেনই। সাংবাদিকদের ওই সভায় প্রকাশিত বক্তব্যগুলো যদিও বেশ আগে থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তারা বলে আসছেন। যার মূল কথা হলো- শিক্ষার অবনতির পেছনে শিক্ষকরাই প্রধানত দায়ী। সুতরাং তাদের টাইট দিতে হবে। সুতরাং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত থাকতে হবে, শিক্ষকদের ক্লাসমুখী হতে হবে, প্রাইভেট পড়ানো একদম বন্ধ করতে হবে, যেতে পারবে না কোচিং সেন্টারে, ভিজিলেন্স টিম থাকবে। যেকোন সময় তারা চলে আসবে, নকল হলেই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যহেতু শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি আরও অনেক পদক্ষেপ। ইতোমধ্যেই স্কুল-কলেজগুলোতে বিভিন্ন নির্দেশসহ সার্কুলার শিক্ষা সচিব পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবায়ন কতটা হচ্ছে সে প্রশ্ন আপাতত থাক। গত বুধবার দৈনিক ইনকিলাব-এ বেরিয়েছে, খুব শিগ্‌গিই স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং নিষিদ্ধ করতে নির্দেশ জারি হচ্ছে। সুতরাং দেখলাম, শিক্ষার সত্যিকার মানোন্নয়নে কর্তৃপক্ষের যখন যথেষ্ট আগ্রহ এবং আন্তরিকতা তখন আর মারমুখী শিরোনাম দিয়ে লেখার দরকার কি? বরং সমস্যাগুলোকে একটু তলিয়ে তুলে ধরে যথার্থ কর্তৃপক্ষকে একটু ভাবতে সাহায্য করতে দোষ কি?

সরকার সাম্প্রতিক যে সমস্ত পদক্ষেপ নিতে চান, নীতিগতভাবেই সে সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকে না। শুধু বাস্তবতার নিরিখে দু'-একটি ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করা ছাড়া। এটা তো সত্যি- শিক্ষক যদি পাঠদানমুখী, ক্লাসমুখী না হন তাহলে তার পেশাগত জীবনের নৈতিক ভিত্তি কোথায়? ক্লাস না করে কিংবা ফাঁকি দিয়ে মাসিক বেতন গ্রহণও কি ধর্মীয়ভাবে সমর্থনযোগ্য? অস্বীকার করার উপায় নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি হচ্ছে। সুতরাং কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ একেবারেই ফেলে দেয়ার মতো নয়। এ নিবন্ধে শিক্ষকতা সম্পর্কে ইদানীং গৃহীত পদক্ষেপ, তার যৌক্তিক অবস্থান, নকল প্রতিরোধে একপেশে সিদ্ধান্ত বা চিন্তা এবং তার প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা থাকছে না। এগুলো বহুভাবে বহুবার বলা হয়েছে। আমরা শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থান এবং উচ্চ শিক্ষা তথা কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার ওপর তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব, যা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আদৌ টের পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না আমাদের কাছে। শিক্ষকরা ক্লাস করছেন না- অপরাধ বিচারযোগ্য, একথা সবাই বলবেন। কিন্তু যদি এমন হয় শিক্ষকরা ক্লাস নিতে পারছেন না, তার জন্য দায়ী কে? সেখানে কার বিচার হওয়া দরকার? শিক্ষকরা কলেজ পর্যায়ে প্রত্যাশিত ক্লাস নেন না- এই সত্যকে সার্বিক ধরে নিয়ে শিক্ষক টাইট দেয়ার নামে অধিকাংশই যে অবাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে, তাতে শিক্ষকরা যে ক্লাস নিতে পারছেন না- এর কারণগুলো অনুদঘাটিত থেকে যাবে। তাতে সমস্যা-সঙ্কট আরও তীব্র হয়েই যে উঠছে ও উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। না এখানে আমি কোন সামাজিক সঙ্কট, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধরন শিক্ষকদের শিক্ষাদানের অন্তরায় এ ধরনের অতিকথন বিষয় নিয়ে বলছিও না, ভাবছিও না।

এ লেখার উপসংহারে যা বলতে চেয়েছি, তাই দিয়েই শুরু করব আলোচনা। বলতে চাই, যা চলছে, তা যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে শুরু করে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজগুলো বসে পড়বে। বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে গোটা কলেজ প্রশাসন ও শিক্ষাদান ব্যবস্থা। আর তা হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেই। কর্তৃপক্ষ এখনই কোন চিন্তা-ভাবনা না করলে শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে শিক্ষক টাইট দেয়ার আমলাতান্ত্রিক চিন্তার কারণে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা তথা উচ্চ শিক্ষার কাঠামো ভেঙে পড়া ঠেকানো যাবে না। স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলছি, ঢাকা ও দেশের অন্যত্র হাতেগোনা দু'-একটি কলেজ বাদ দিলে, দেশব্যাপী অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স পর্যায়ের কলেজের শিক্ষকরা ক্লাস নিতে পারছেন না শত আন্তরিকতা সত্ত্বেও। এখানে কোন লেখাপড়া হচ্ছে না। হবে না। শিক্ষক উপস্থিতির দশটা-চারটা নির্দেশ, ক্লাসমুখী হওয়া হাস্যকর শিক্ষকদের কাছেই। এতে করে বাস্তবতার নিরিখেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ক্রেডিট বিলটি' শিক্ষকদের কাছে ম্রিয়মাণ হচ্ছে। শৃঙ্খলার স্বার্থে বা অন্য কোন কারণে প্রকাশ্যে শিক্ষকরা এখন পর্যন্ত কিছু বলছেন না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবাই ফুঁসছে। আশাকরি শিক্ষামন্ত্রী তা মূল্যায়ন করবেন। অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজের শিক্ষকরা এখন রাতদিন, এমনকি সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কেরানির কাজ করছেন। একেবারেই দু'-একটি হয়ত বাদ দিয়ে সবগুলো কলেজ প্রশাসন গড়ে উঠেছে স্নাতক পর্যায়ের মাপকাঠিতে। অফিসের লোকবল সে পর্যায়েই নির্ধারিত। হঠাৎ কলেজগুলোতে খুলে দেয়া হলো আট-দশটা বিষয়ের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স। কলেজ প্রশাসনের লোকবল বৃদ্ধি করা হলো না। একই প্যাটার্নের রয়ে গেল। সুতরাং প্রশাসনিক দায়িত্বের বোঝা দিনের পর দিন পর্বতাকারে গিয়ে পড়ছে বিভাগগুলোর ওপর। সিংহভাগ কলেজে এনাম কমিটির পদের প্যাটার্ন অনুযায়ী অনার্স থাকলে ৭ জন এবং অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু থাকলে ১১ জন শিক্ষকের পদ যেখানে থাকার কথা সেখানে সর্বোচ্চ ৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। অনেক বিভাগে রয়েছে তারও নিচে এবং অনেক কলেজে। শিক্ষকরা প্রতিদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা বিভিন্ন সার্কুলারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এক একটা বর্ষে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফরম ফিলাপ, এসআইএফ, ওএসআর, পরীক্ষা পরিচালনা করা অর্থাৎ অনার্স প্রথম পর্ব থেকে মাস্টার্স শেষ বর্ষ পর্যন্ত শ্রেণীসমূহের যাবতীয় কাজ করে যাচ্ছেন। এর সঙ্গে রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রান্তি, ভোগান্তিমূলক সার্কুলার, পরস্পর বিপরীতধর্মী পদক্ষেপ, অস্পষ্টতা, সময়মতো সার্কুলার না পাঠানো সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি সামাল দেয়া। কঠিন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, একটা বর্ষের নিয়মিত- অনিয়মিত, পাঠ বিরতি সংক্রান্ত জটিলতার সমাধান। প্রতিটি বর্ষেই দিনকে দিন জমে উঠছে ব্যাক লগ বা পুঞ্জীভূত সমস্যা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার কোন সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা নেই, নেই কোন নিয়মনীতি। মনে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে শিক্ষকদের। দু'হাজার অথবা দু'হাজার এক শিক্ষা বর্ষের সঙ্গে আটানব্বই শিক্ষাবর্ষের অনিয়মিত, এক বিষয়ের অকৃতকার্য অথবা কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ের পরীক্ষা কি হবে, ফি কত লাগবে তার সব বিবরণ পাঠাতে হবে দু'দিনের মধ্যে। দিনের পর দিন বিভাগ ও কলেজ প্রশাসন, কলেজ প্রশাসন ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক জটিল হয়ে পড়ছে। আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসের এরকম কাজের একটি ক্ষুদ্র নমুনা দিচ্ছি।

(এক) মাস্টার্স প্রথম ও শেষ বর্ষের ফরম ফিলাপ। (দুই) একই সঙ্গে সাবসিডিয়ারি, অকৃতকার্য, রেফার্ডপ্রাপ্ত এবং এক বিষয়ে অকৃতকার্যদের পরীক্ষা ফরম পূরণ, (তিন) ডিগ্রি পাস কোর্স/ ফরম পূরণ, নিয়মিত/ অনিয়মিত/ মানোন্নয়ন/ প্রাইভেট/ সার্টিফিকেট কোর্সের ফরম পূরণ (চার) সাবসিডিয়ারি নিয়মিত/ ২০০১ সালের অকৃতকার্য/ রেফার্ডপ্রাপ্ত এবং এক বিষয়ের অকৃতকার্যদের ফরম পূরণ ইত্যাদি। এর সঙ্গে কোন বছরের পরীক্ষার্থীদের ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা এবং ৫০ নম্বরের কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা, আবার কোন বছরের একশ' নম্বরের কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা। এক একটা বর্ষের পরীক্ষা অতীতের এক একটা বছরের সিলেবাস অনুযায়ী অনুষ্ঠানের নির্দেশ। এই সমস্ত কিছুর ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে এক একটি বিভাগের সর্বোচ্চ চার অথবা তিন জন শিক্ষককে। এর মধ্যে আবার অনার্স কোর্স চার বছরের এবং ডিগ্রি পাস কোর্স তিন বছরের করা হয়েছে। বছরের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেল। এখনও ডিগ্রি পাস কোর্সের কোন সিলেবাস তৈরি করা হয়নি। অনার্সের করা হয়েছে এক বছরের। এরকম প্রতিটি কলেজে গেলে দেখা যাবে শিক্ষকরা ফাইল নিয়েই দৌড়াদৌড়ি করছেন। এরপরে রয়েছে অসংখ্য ভুলভ্রান্তি। মোট কথা একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থা। এখন শিক্ষকরা কখন পড়াবেন এবং কখন নিজেরা পড়বেন? সরকারের সাম্প্রতিক গৃহীত পদক্ষেপগুলো নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করি, আমাদের বর্তমান অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে কলেজগুলোতে যা হচ্ছে, আছে কি এ ধরনের দৃষ্টান্ত আমাদের পার্শ্ববর্তী কোন দেশে? এরপর যদি সবেধন নীলমণি ওই চারজন শিক্ষককে একাদশ প্রথম বর্ষ থেকে মাস্টার্স শেষ বর্ষ পর্যন্ত আট-দশটা ক্লাস নিতে হয় নিয়ম অনুযায়ী, তা হলে তার চিত্র কতটা ভয়াবহ, শিক্ষামন্ত্রী আর শিক্ষা সচিব মহোদয় ভাবতে পারবেন কি? আমলাদের শিক্ষকদের প্রতি নাক সিটকান যতই থাক, আজ যদি এই সমস্ত কলেজের শিক্ষকরা সমস্বরে চিৎকার করে বলে- আমরা ক্লাস নেব না, নৈতিকভাবেই তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা তখন নেয়া হবে- আমাদের তাই জানতে ইচ্ছে করে বর্তমান এ মুহূর্তে। শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা না হয় এখন আর বলছি না। অন্তত বিভাগগুলোতে একজন করণিকের দায়িত্বে এবং একজন পিওনের দায়িত্বে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে উঠছে। এই পদ সৃষ্টিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আপত্তি থাকলে কলেজ পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধ্যক্ষদের নির্দেশ দেয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এর জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা স্থানীয়ভাবেই না হয় করার চিন্তা করা যেতে পারে। এর সঙ্গে রয়েছে পাঠদানগত পার্থক্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের প্রশ্নপত্রের সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের গুণগত পার্থক্য রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নমানের বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একই দেশে এই দুই ধারা আদতেই চলতে পারে কি? আমরা অবাক হচ্ছি এই ভেবে, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার মানোন্নয়নে কত চিন্তাই না করছেন, শিক্ষকদের কত শাস্তিদানের ব্যবস্থাই তো করছেন, কিন্তু অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের কলেজগুলোতে যে নীরব বিশৃঙ্খলা চলছে শিক্ষার ক্ষেত্রে তা এখনও তাদের দৃষ্টিতে আসল না কেন? শিক্ষকরা চারটা পর্যন্ত কলেজে থাকবে, আপত্তি নেই। কিন্তু পড়ানোর জন্য তাদের রাত জেগে যে প্রস্তুতি নিতে হয়, পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করছেন, সে দায়িত্ব কোন্ সময়ের মধ্যে পড়বে জানতে ইচ্ছে করছে- একটা হালকা প্রশ্নই শুধু রাখলাম এখানে। প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং সেন্টারে গিয়ে পড়ানো বন্ধ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করছি; কিন্তু দেখবেন এতে গোটা ব্যাপারটাই ভেস্তে গিয়ে যেন সার্বিক ব্যবস্থার কোন বিকৃতায়ন না ঘটে। কারণ পাশের দেশ ভারতের শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর দিকে, সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার দিকে একটু তাকান। শুধু বাহবা নেয়ার জন্য আপাতত পদক্ষেপ বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়তে যে বাধ্য তা আমরা এমন অতীতেও দেখেছি। সুতরাং শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রশ্নে সরকারের ঘোষিত পদক্ষেপগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান নিবন্ধের বক্ষমাণ সমস্যাটি শুধু তুলে ধরলাম। এখন দেখব কর্তাব্যক্তিরা কি বলেন?

প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং সেন্টারে গিয়ে পড়ানো বন্ধ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করছি; কিন্তু দেখবেন এতে গোটা ব্যাপারটাই ভেস্তে গিয়ে যেন সার্বিক ব্যবস্থার কোন বিকৃতায়ন না ঘটে। কারণ পাশের দেশ ভারতের শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর দিকে, সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার দিকে একটু তাকান। শুধু বাহবা নেয়ার জন্য আপাতত পদক্ষেপ বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়তে যে বাধ্য তা আমরা এমন অতীতেও দেখেছি। সুতরাং শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রশ্নে সরকারের ঘোষিত পদক্ষেপগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান নিবন্ধের বক্ষমাণ সমস্যাটি শুধু তুলে ধরলাম। এখন দেখব কর্তাব্যক্তিরা কি বলেন?